

সাংখ্যদর্শন অনুসারে দুঃখের স্বরূপ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
শ্রীমতী চ্যাটার্জী

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/7_Snigdha-Chatterjee.pdf

Abstract: Summary of the Samkhya View on Suffering The paper presents an academic study of the nature of Suffering (Duḥkha) and its cessation according to the Samkhya Darshana, one of the oldest dualistic schools of Indian philosophy founded by Maharshi Kapila. 1. The Nature and Cause of Suffering • Goal of Philosophy: The central aim of Indian philosophy, and Samkhya, is the absolute and exclusive elimination (ātyantika ekañtika nivṛtti) of suffering, leading to Moksha (liberation) or Kaivalya. Life is Suffering: Samkhya asserts that life is dominated by suffering, and any happiness is temporary, mixed with pain, and merely an illusion compared to the constant threat of misery (compared to “crow meat”).

Material Cause: Suffering is a modification (pariṇāma) of the Rajoguna of Prakriti (Nature). Since Prakriti and its constituents (the world) are eternal, suffering is also considered eternal in nature, though its effect can be suppressed (abhibhava). Metaphysical Cause (Bondage): The root cause of suffering is Avidyā (False Knowledge) or Aviveka (Non-discrimination). This is the delusion of mistaking the non-self (Prakriti, body, mind) for the Purusha (the eternal, pure Self). This non-discrimination leads to the conjunction (saṃyoga) of Purusha and Prakriti, causing the Purusha to falsely experience the pain that belongs only to the modifications of Prakriti. 2. The Threefold Suffering (Duḥkhatraya) All worldly suffering is categorized into three types: Adhyātmika Within the individual (Body and Mind). Physical suffering (disease from humor imbalance) and Mental suffering (grief, anger, fear, desire). 2. Ādhibhautika From External Beings (living or non-living). Affliction caused by humans, animals, plants, etc. 3. Ādhidaivika From Cosmic/Divine Forces. 3. The Path to Cessation (Moksha) Rejection of Worldly Means: Samkhya rejects ordinary Drishta (secular) and Vedic (ritualistic) actions, as they provide only temporary relief and cannot achieve the absolute destruction (ātyantika vināśa) of suffering. The Only Way: The sole means to liberation is Tattva Jñāna (Knowledge of Truth) or Viveka Jñāna (Discriminative Knowledge). Viveka Jñāna.

This is the realization of the absolute distinction between the Purusha (Knower) and the Prakriti (the Manifest and Unmanifest). Liberation: When this knowledge is achieved, the Aviveka is destroyed, the bond between Purusha and Prakriti is severed, and the Purusha reverts to its eternal, free state of Kaivalya (Isolation). Types of Liberation: Jīvanmukti: Liberation experienced while the body remains, upheld by Prārabdha Karma. Videhamukti: Final and complete liberation attained after the death of the body.

Keywords: Samkhya, Suffering, Avidyā (False Knowledge), Aviveka (Non-discrimination, Prārabdha Karma, Videhamukti).

উপক্রমণিকা:

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।

বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে করে মারতে।।

ভারতীয় দর্শন আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। জীবন থেকে দুঃখের অবসান ঘটানো হলো ভারতীয় দার্শনিকদের লক্ষ্য। অনাদিকাল থেকেই দুঃখাগ্নির দাবানলে জীব দগ্ধ হচ্ছে। এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জীবকুল ব্যাকুল। তার জন্য লৌকিক ও বৈদিক বিভিন্ন কর্মশালায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছে জীবকুল। কিন্তু কর্মের মাধ্যমে দুঃখের আপেক্ষিক অবসান ঘটলেও সর্বথা উপশম হয় না। ভারতীয় দর্শন মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত — ১. আস্তিক, ২. নাস্তিক। আমরা সাধারণত জানি, ‘আস্তিক’ বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরের বিশ্বাসী, এবং ‘নাস্তিক’ বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে এই শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থে প্রকাশিত। ভারতীয় দর্শনে ‘আস্তিক’ বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যারা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেছেন। অপরদিকে যারা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেননি তাঁরা নাস্তিক। এ বিষয়ে মহামুনি পাণিনি তাঁর ‘অষ্টাধ্যায়ী’ গ্রন্থে বলেছেন — অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ^১। অর্থাৎ ‘আছে’ এমন বুদ্ধি যার সেই আস্তিক এবং ‘নেই’ এমন বুদ্ধি যার সে হলো নাস্তিক। এখানে ‘আছে’ বলতে পরলোকের অস্তিত্বের বিশ্বাস আছে যার সে আস্তিক এবং ‘নেই’ বলতে পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার সে নাস্তিক এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই অর্থ ধরে নাস্তিক আস্তিক বিভাজন হয়নি। যেমন বৌদ্ধ দার্শনিকেরা পরলোকে বিশ্বাসী হলেও ভারতীয় দর্শনে তাঁদের নাস্তিক দর্শন রূপেই অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নি।

মুনা তাঁর মনুসংহিতায় ‘নাস্তিক’ শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ^২ অর্থাৎ যারা বেদের নিন্দা করেন তাঁরা নাস্তিক। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের অনুভূত উপলব্ধি সত্যের সংগ্রহই হলো বেদ। সনাতন মতে, বেদ হলো নিত্য, অপৌরুষেয়। এক কথায় বলা যায় আস্তিক দর্শন হলো বৈদিক দর্শন এবং নাস্তিক দর্শন হলো অবৈদিক দর্শন। ভারতীয় দর্শনের নব সম্প্রদায়ের মধ্যে ষড়্দর্শন হলো আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। যথা — সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-মীমাংসা-বেদান্ত এবং ত্রয় নাস্তিক দর্শন হলো চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন। এই ষড় আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও যেহেতু তারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী তাই তারা আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আর চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন বেদ বিরোধী হওয়ায় তারা নাস্তিক সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য।

ভারতীয় দর্শনের দুঃখাত্মক জীবনতত্ত্ব:

ভারতীয় দর্শন হলো জীবননিষ্ঠ দর্শন। তাই জীবনের সঙ্গে যা কিছু জড়িত তার বাইরে উদ্ভট কল্পনা ভারতীয় দর্শনের মতে তাৎপর্যহীন। অনাদিকাল থেকে জীব দুর্বিষহ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে। জগতে সুখের চাইতে দুঃখের পরিমাণ অনেক বেশি। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই দুঃখ তাকে গ্রাস করে, তাই সে কেঁদে ওঠে। কারণ মাতৃজঠরে সে সুরক্ষিত ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন পর যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করে এবং কেঁদে ওঠে। জীবনের শুরুরেই কান্না এবং সে কান্না সারা জীবন ধরে যেন চলতে থাকে। মানুষের দেহ একটি যন্ত্র, সেই যন্ত্রে মাঝে মাঝে মরিচা ধরে তার ফলে আসে নানা রোগ এবং তার থেকেই আসে দুঃখ। জীবনের যা চাহিদা সেটা পূরণ হলেও দুঃখ, পূরণ না হলেও দুঃখ। কেননা, না পেলে মনে আছে কেন পেলাম না আর ভোগ্য বস্তু লাভ হলে মনে আসে আরো কেন পেলাম না। কবি এ প্রসঙ্গে তাই বলেছেন — এ জগতে হয় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি।^৩

শুধুমাত্র পাওয়া না পাওয়ার মধ্যেই তো দুঃখ সীমাবদ্ধ নয়, এর বিস্তার সীমাহীন। শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু জীবকুলকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে রাখে। পৃথিবীতে এমন কোনো জীব নেই যাকে কোনোদিন দুঃখ শোক স্পর্শ করেনি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও পুত্র শোকে ব্যাকুলা মাতার কাহিনি মনে পড়ে। শোকাতুরা জননী যখন বুদ্ধদেবের কাছে তার মৃত সন্তানকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কাতর আবেদন করতে থাকেন বুদ্ধদেব

বলেছিলেন — যদি এমন কোনো গৃহ থেকে কিছু সর্বের দানা নিয়ে আসতে পারেন, যে গৃহে শোকের ছায়া কখনো পড়েনি, তাহলে তিনি তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই মাতা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও এমন কোনো গৃহ পেলেন না যেখানে শোক নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখরূপ বর্ষারই প্রাবল্য। মাঝে মাঝে যে সুখের অভিজ্ঞতা হয় তা তো সাময়িক বিদ্যুৎ ছটার প্রকাশ মাত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে —

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষবর্ষেভ্য ভূয় এবাভিবর্ধতে।।

অর্থাৎ কামনা কখনোই কাম ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে না। অগ্নিতে শূকনো কাঠ দিলে যেমন অগ্নি নির্বাপিত না হয়ে আরো বেশি প্রজ্জ্বলিত হয়; ঠিক তেমনি কামনার দ্বারা বাসনা উজ্জীবিত হয়। কখনোই তা প্রশমিত হবে না ফলে দুঃখ বাড়ে। জীবনের দুঃখ, দুর্গতি, শোক, রোগ, জরা প্রভৃতি দেখে ভারতীয় দার্শনিকেরা চিন্তিত হয়েছেন। শুধুমাত্র কৌতুহল নিরশনই নয়, জীবনকে দুঃখ মুক্ত করে এক সুন্দর জীবন গড়ে তোলাই হলো দর্শন আলোচনার উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন কামনাই হলো দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক উচ্ছেদ এবং সর্বাতিশায়ী সুখের নিত্য প্রাপ্তি। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্ন নিত্য ও নিরতিসয় সুখ কোনো কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। এ বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হয়েছে — ন হ্যকৃতঃ কৃতেন। অর্থাৎ ‘কৃতেন’ কর্মের দ্বারা ‘অকৃতঃ’ অনুৎপন্ন নিত্য সুখ কখনোই সম্ভব নয়। চার্বাক ভিন্ন প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষাভিলাষী। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে — ‘বান্দনালক্ষণং দুঃখম্’^৪ অর্থাৎ দুঃখ হলো আমাদের কামনা বাসনা প্রবৃত্তির পূর্ণতার অভাব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে — দুঃখ হলো প্রকৃতির রজঃগুণের পরিণাম বিশেষ। জৈন মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনেও জীবদশাকেই দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে মূলত সাংখ্য দর্শনের মতে দুঃখের স্বরূপ ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বিষয়ক আলোচনাই আমাদের বিষয়। সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য দর্শনকেই অনেকেই প্রাচীনতম দর্শন বলে গণ্য করে থাকেন। মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। সেইজন্য সাংখ্য দর্শন ‘কপিল দর্শন’ নামেও পরিচিত। কঠ, ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, মৈত্রায়নী, বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, পুরাণে সাংখ্য প্রত্যয়ের উল্লেখ দেখে সততই মনে হয় এই সমস্ত উপনিষদের আগেই সাংখ্য দর্শন একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। ন্যায় দর্শনের বাৎসায়নভাষ্য এবং তার পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সাংখ্য মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সাংখ্য মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছে — অসজ্জোহয়ং পুরুষঃ।^৫ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সাংখ্য শব্দের উল্লেখ করেছে — তৎ কারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্।^৬ সাংখ্য দর্শনের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ করা যায়। অনেকের মতে সংখ্যা শব্দ থেকেই সাংখ্য শব্দটির উৎপত্তি। সাংখ্য শব্দের অর্থ গণনা বা পরিসংখ্যান। সাংখ্য দর্শন পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিসংখ্যান বা গণনা করা হয়েছে বলেই এই দর্শনকে সাংখ্য দর্শন বলা হয়। আবার অনেকে বলেন, সাংখ্য শব্দের অর্থ ‘সম্যক্ জ্ঞান’। সাংখ্যরা দ্বৈতবাদী দার্শনিক। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি হলো সাংখ্যের মূল তত্ত্ব। এই দুই মূল তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হলেই সমস্ত দুঃখ, শোক থেকে মুক্ত হয়ে জীব কৈবল্য বা মুক্তি লাভ করতে পারবে। অনাদি মিথ্যা জ্ঞানবশত অনাত্ম বিষয়কে আত্ম স্বরূপ মনে করে মিথ্যা ভ্রম জ্ঞান হেতু বন্ধ জীব অহর্নিশ দুঃখ অনুভব করে থাকে। সুতরাং মিথ্যা জ্ঞানই হলো দুঃখের কারণ। পাতঞ্জল সূত্রে বলা হয়েছে — অনিত্যাশুচি দুঃখানাশ্চ সু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।^৭ আরো বলা হয়েছে — ‘বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্’। যোগবার্তিককার বিজ্ঞানভিক্ষু এ প্রসঙ্গে বলেছেন — অবিদ্যৈব মূলং দুঃখবীজম্। সাধারণ ব্যক্তির বিষয় থেকে কখনো সুখ কখনো বা দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়কে দুঃখেরই নিদান বলে মনে করে থাকেন। অর্থাৎ বিবেকগণ বিষয় সুখকেও দুঃখ স্বরূপ বলে থাকেন। অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মতো সাংখ্য দার্শনিকরাও জীবনে সুখের চাইতে দুঃখের মাত্রাধিক্যের কথা স্বীকার করেছেন। জীবনে সুখ, আনন্দ, উল্লাস সবই আছে কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি আছে দুঃখের পরিমাণ। যেমন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থ হয়েই অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। কোনো জীব অল্লাধিক দুঃখ পরিহার করতে পারলেও অনিবার্য মৃত্যু, জরা, ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এইজন্য সাংখ্যকারগণ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতোই বলেছেন

জীবন দুঃখময়। জীব জীবন নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখে পরিপূর্ণ। দুঃখবিহীন জীবন কল্পনাও করা যায় না। সাংখ্য মতে সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সকল বস্তুর মধ্যেই দুঃখ সুপ্ত অবস্থায় আছে। পৃথিবীতে কিছু বিষয় আছে যাদের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। এই অবিতর্কিত বিষয় সমূহের মধ্যে দুঃখ সর্বাগ্রগণ্য।

জীবনের ত্রিবিধ দুঃখ:

জীব যেটাকে প্রতিকূল মনে করে সেটাই দুঃখ নামে অভিহিত করা হয় — যৎ প্রতিকূলবেদনীয়ং তৎ দুঃখম্।^১ পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেন নি। তবে বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলেন — দুঃখং রজঃ পরিণামভেদে।^২ অর্থাৎ দুঃখ হলো রজগুণের পরিণাম। প্রকৃতির রজগুণ হলো নিত্য। সুতরাং তার পরিণাম দুঃখও নিত্য। আমরা জানি, যা নিত্য তার বিনাশ সম্ভব নয়, তাই সেই অর্থে দুঃখেরও নাশ হয় না। তবে দুঃখ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত রজগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থা রজগুণে অভিভূত হতে পারে। অতএব দুঃখের নাশ সম্ভব না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। সেই কারণে দুঃখের নিবৃত্তি বলতে বোঝায় দুঃখের অভিভব বা নিবারণকে। সাংখ্য মতে — যদ্যপি ন সন্নিবৃত্ত্যতে দুঃখম্, তথাপি তদভিভবঃ শক্যঃ।^৩ সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে যে জীব যতদিন শরীর ধারণ করবে ততদিন তাকে জরা মৃত্যুর জন্য দুঃখ, শোক ভোগ করতেই হবে। সুতরাং দুঃখ ভোগ হলো জীবের স্বভাব। সুখের পরিণাম খুবই কম। সুখ যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই সুখ হলো দুঃখ মিশ্রিত, অস্থায়ী। সাংখ্য গ্রন্থে একটি ক্লোকে জগতের সুখকে কাক মাংসের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে — কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বপ্নং তদপি দুর্লভম্।^৪ কাক মাংস সাধারণত কষা ও বিস্বাদ। সেই মাংস যদি কুকুরের উচ্ছিষ্ট হয় তবে তা খাবারের যোগ্য নয়। আর সেই অখাদ্য মাংস খেয়ে যদি তৃপ্তি না আসে তাহলে ভোজনকারীর যে অবস্থা হয়, সুখের সম্বন্ধে মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় জগতের এই দুর্বিষহ দুঃখকে ‘দুঃখত্রয়’ এই শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত করে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ। এই দুঃখ তিনটি প্রকার যুক্ত। অতএব দুঃখ বলতে সাংখ্য কারিকায় — দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ম্। এ কথা বলা হয়েছে। আমাদের জীবনের যত দুঃখ আছে তা এক ধরনের নয়, সেই সব দুঃখগুলিকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে — ১। আধ্যাত্মিক দুঃখ, ২। আধিভৌতিক দুঃখ, ৩। আধিদৈবিক দুঃখ।

১। আধ্যাত্মিক দুঃখ:

আধ্যাত্মিক দুঃখ অধ্যাত্ম সম্বন্ধী যে দুঃখ তাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। অধ্যাত্ম+য়িক প্রত্যয় করে আধ্যাত্মিক শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সাংখ্য মতে আত্মা আ পুরুষে কোনো দুঃখ বা শোক স্পর্শ করতে পারে না। কারণ আত্মা বা পুরুষ হলো নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সাংখ্যকারিকায় এ প্রসঙ্গো বলা হয়েছে —

তস্মান্নবধ্যতেহস্থা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাস্রয়া-প্রকৃতিঃ।^৫

আত্মাকে অধিকার করে থাকে দেহ ও মন — আত্মানমধিকৃত্য বর্ততে শরীরং মনশ্চেতি অধ্যাত্ম। অতএব ‘অধ্যাত্ম’ শব্দে মন ও দেহ উভয়কেই বোঝায়। আত্মগত শরীর ও মনকে নিমিত্তরূপে অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক দুঃখ আবির্ভূত হয়। এইজন্য শরীর ও মন সম্বন্ধীয় সব দুঃখই শারীরিক ও মানসিক। বাত, পীত, ক্লেমা — এই ত্রিধাতুর বৈষম্যবশত শরীরকে কারণরূপে গ্রহণ করে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাকে শরীর দুঃখ বলে। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিবাদ, প্রিয়জন বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বস্তুর অপ্ৰাপ্তিবশত যে দুঃখ জন্মায় সেটা মানসিক দুঃখ। এই শারীরিক ও মানসিক দুই প্রকার দুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

২। আধিভৌতিক দুঃখ:

আধিভৌতিক শব্দটি বিশ্লেষণ করে পাই অধিভূত+য়িক। অধিভূত কথার অর্থ হলো স্থাবর ও জঙ্গমাди ভূত সমূহকে অধিকার করে। এখানে স্থাবর বলতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পর্বতাদিকে এবং জঙ্গম বলতে মানুষ, পশু, ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এক কথায় আধিভৌতিক দুঃখ হলো বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ।

৩। আধিদৈবিক দুঃখ:

আধিভৌতিক দুঃখের মতো আধিদৈবিক দুঃখও বাহ্য কারণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অধিদেব+গ্নিক প্রত্যয় যোগে আধিদৈবিক পদটি গঠিত। দেবতার কোপে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যেসব দুঃখ আসে তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। যেমন ভূমিকম্প, বজ্রপাত, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতির কোপ থেকে জন্ম নেয় আধিদৈবিক দুঃখ। মানুষ জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখান্বিতে পীড়িত হচ্ছে। দুঃখ জগতের একটি উপাদান। জগতের সব কিছু দুঃখ মিশ্রিত। দুঃখ ত্রয়ের বিনাশকেই পুরুষার্থ বা মুক্তি বলা হয়। সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত জীব দেহ ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত জীব জরা মরণাদি দুঃখ ভোগ করবে। এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ হলো বন্ধন। আর এই দুঃখের আত্যন্তিক ঐকান্তিক উচ্ছেদই হলো মুক্তি। এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে — ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।^{১০} বিদ্যমান এই ত্রিবিধ দুঃখের সঙ্গে বন্ধ জীবের নিত্য সম্বন্ধ হওয়ায় দুঃখ ত্রয়ের বিনাশক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তত্ত্ব বিষয়ে পুরুষের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থগুলি থেকে ভেদ তত্ত্বে ও শূন্য আত্মতত্ত্বে প্রেক্ষাবান মুমুক্শু জনের জিজ্ঞাসা হয়। ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের প্রথমেই তাই বললেন

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।

দৃষ্টে সাপার্থা চৈত্নেকান্তাত্যন্তোহভাবাৎ।।^{১৪}

এই জগতে দুঃখ বলে যদি কিছু না থাকতো বা তার অত্যন্ত উচ্ছেদ না হতো তাহলে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে মুমুক্শুর জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি হতো না। এ কথা বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলেছেন — এযাং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ, সদ্ধা ন জিহাসিতম্, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদম্।^{১৫} এই দুঃখ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকাল ধরেই চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে পাতঞ্জল দর্শনে স্মরণীয় — হেয়ং দুঃখমনাগতম্।^{১৬} সাধনপাদে বলা হয়েছে ভাবী দুঃখ রাশিকে বিদূরিত করার জন্য আগে তার কারণকে জানতে হবে। আমরা এ জন্মে যে সকল দুঃখ পাই তার কারণ জন্ম। আর জন্মের কারণ তৃষ্ণা ও কাম্যকর্ম এবং তার কারণ মিথ্যা জ্ঞান। সুতরাং হেয় দুঃখসমূহের মূল কারণ মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম জ্ঞান। আর এই মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হবে শূন্যতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা। এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তির জন্য সাধারণ মানুষ দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়কে অবলম্বন করে। যেমন পূজা-অর্চনা, শ্রাদ্ধ-শান্তির আয়োজন করে থাকে। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন দৃষ্ট কিংবা বৈদিক কোনো উপায়েই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। সাংখ্য মতে অনাদি অবিবেকবশত প্রকৃতি ও পুরুষের যে সংযোগ হয় তার ফলে চিত্তে পুরুষের প্রতিবিশ্ব পাত হলেই দুঃখ সম্বন্ধ স্বরূপ বন্ধন হয়। প্রকৃতি সংযোগ ছাড়া নিত্য, শূন্য পুরুষের দুঃখ সংযোগ রূপ বন্ধন সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে — ন নিত্যশূন্যবুদ্ধিমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগাৎ ঋতে।^{১৭} তাই প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকবশত সংযোগ নাশ হলেই পুরুষে আরোপিত দুঃখ সমূহের নাশ হয়। সাংখ্য মত অনুসরণ করে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকায় বলেছেন — জ্ঞানেন চ অপবর্গ।^{১৮} অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায় হলো তত্ত্বজ্ঞান। আর এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ হলো ‘ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান’ — ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।^{১৯}

ব্যক্ত ----- প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়বিংশতি তত্ত্ব

অব্যক্ত----- প্রকৃতি (ব্যক্তের কারণ স্বরূপ)

জ্ঞ----- পুরুষ

সহজ কথায় আত্মা (পুরুষ) ও অনাত্মার (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) ভেদ জ্ঞানই হলো বিবেক জ্ঞান। প্রকৃতি ও পুরুষের সাক্ষাৎকারাত্মক বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হলে প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক — নিবৃত্ত হয়ে যায়। অবিবেক নিবৃত্ত হলে বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। তার ফলে বুদ্ধির বৃত্তিরূপ উপাধির দ্বারা পুরুষের আরোপিত যে দুঃখ তা অনন্তকালের জন্য অবশ্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই ভাবেই বিবেক জ্ঞানের দ্বারাই অবিবেক নষ্ট হয়। যেমন আলোকের দ্বারা অন্ধকারের বিনাশ হয়। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে ‘জ্ঞানাৎ মুক্তি’।

উপসংহার: এই প্রবন্ধে আলোচিত হলো যে প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানই সকল প্রকার বন্ধনের কারণ। তাই যখন বিবেক জ্ঞানবশত প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান উপলব্ধি হয় তখন পুরুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থানই হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখের মুক্তি। এই অবস্থায় পুরুষ বা আত্মার জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তাভাব থাকে না। তবে কৈবল্য বা মুক্তি লাভে আত্মা কোনো নতুন ধর্ম লাভ করে না। আত্মা কখনোই বন্ধ নয়, আত্মা চিরমুক্ত, নিত্য, শূন্য। অবিবেকবশতই আত্মা নিজেকে বন্ধ মনে করে। সাংখ্যদর্শনে দু প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে, জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ মুক্তি। বিবেক জ্ঞান লাভ করে জীব যখন প্রকৃতির সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন করে কিছুকাল অবস্থান করে, তখন তাকে বলে জীবন্মুক্ত অবস্থা। প্রারম্ভ কর্মের ফল ভোগের জন্য জীবন্মুক্ত পুরুষকে দেহ ধারণ করতে হয়। আর প্রারম্ভ কর্মফল নিঃশেষিত হলে মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত পুরুষ বিদেহমুক্তি লাভ করে। তখন তত্ত্ব জ্ঞানীর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। সেই মোক্ষ লাভই হলো আমাদের পরম লক্ষ্য বস্তু।

তথ্যসূত্র:

১. ‘পাণিনি’ সূত্র ৪/৪/৬০
২. ‘মনুসংহিতা’ ২/১১ পৃ. ৬৫
৩. ‘দুই বিঘা জমি’, ‘কাহিনী’ কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪. ন্যায়সূত্র, ১/১/২১
৫. ‘ভারতীয় দর্শন’, জগদীশ্বর সান্যাল, পৃ. ৩২০
৬. ওই
৭. ‘যোগদর্শন’, সাধনপাদ, সূত্র ৫, পৃ. ৫০
৮. ‘যোগদর্শন’, সমাধিপাদ, সূত্র ৮, পৃ. ১৮
৯. ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’, পৃ. ১১
১০. ‘ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা’, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য্য, পৃ. ১৪২
১১. ‘ভারতীয় দর্শন’, জগদীশ্বর সান্যাল, পৃ. ৩৪২
১২. ‘সাংখ্যকারিকা ৬২ নং শ্লোক’, স্বামী ভাবঘনানন্দ
১৩. ‘সাংখ্যসূত্র’ ১/১
১৪. ‘সাংখ্যকারিকা’, স্বামী ভাবঘনানন্দ, পৃ. ১
১৫. ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’, বাচস্পতি মিশ্র, পৃ. ৮
১৬. ‘যোগদর্শন’, সাধনপাদ, পৃ. ৫৭
১৭. ‘সাংখ্যসূত্র’, ১/১১
১৮. ‘সাংখ্যকারিকা’, ৪৪ নং শ্লোক
১৯. ওই ২ নং শ্লোক

সহায়ক গ্রন্থ:

- ভট্টাচার্য্য সমরেন্দ্র, ‘ভারতীয় দর্শন’, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩
- সান্যাল জগদীশ্বর, ‘ভারতীয় দর্শন’, শ্রীভূমি পাবলিশিং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯
- চক্রবর্তী নিরোদবরণ, ‘ভারতীয় দর্শন’, দত্ত পাবলিশার্স, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯
- গোস্বামী নারায়ণচন্দ্র, ‘সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি কলকাতা ৬
- ভট্টাচার্য্য অমিত, ‘ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা’, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণি, কলকাতা ৬
- বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র, ‘মনুসংহিতা’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা ৬
- পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, স্বামী ভাবঘনানন্দ, সাংখ্য কারিকা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

লেখক পরিচিতি: স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, SACT-1, রামপুরহাট কলেজ, সংস্কৃত বিভাগ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।